জাভায় কালচার সিস্টেমঃ ডাচ সরকারের বাণিজ্যতান্ত্রিক একচেটিয়াবাদ ও উন্নয়ন কৌশল।

মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান*

সার-সংক্ষেপ: হল্যান্ড ইউরোপের একটি ছোট অথচ সাহসী ও উদ্যোমী দেশ। হল্যান্ডের ডাচ জাতি ছিল রেনেসাঁস উজ্জিবীত এবং অপূর্ব নৌ-শক্তির অধিকারী। সতের শতকে ইউরোপের উদীয়মান রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে বিশ্বব্যাপী যে বানিজ্যিক ও উপনিবেশিক প্রতিযোগিতা শুরু হয় তাতে অস্থিত্ব রক্ষার্থে ডাচরাও সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে এবং অপ্রতিরোধ্য নৌ-শক্তি বলে প্রতিদ্বন্দ্বি পর্তুগীজ ও ব্রিটিশদের পরাভূত করে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে একটি একচেটিয়াবাদী বাণিজ্যতান্ত্রিক উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। আঠার শতকের প্রথম দিকে ডাচরা সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলে সর্বশ্রেষ্ঠ নৌ-শক্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু তাদের এ অবস্থান বেশী দিন অক্ষুন্ন থাকেনি। আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই নানা কারণে তাদের অবক্ষয় প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। এমতাবস্থায় ডাচরা নিজ স্বার্থে উপনিবেশ দ্বীপপুঞ্জ ভূমি ব্যবস্থাপনা ও কৃষিনীতির প্রতি মনোনিবেশ করে এবং গোটা আঠারো শতক ব্যাপী ভূমিতে নানা নীতি ও পদ্ধতি প্রয়োগের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়ে উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে এক নতুন কৃষি ব্যবস্থা চালু করে, ইতিহাসে এটি 'Culture system' নামে পরিচিত। বস্তুত এ ব্যবস্থাটি ছিল একটি সামন্ত নির্বতন মূলক ব্যবস্থা। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধোত্তর কালে বিপর্যস্ত হল্যান্ড সরকার তাদের বাণিজ্যিক একচেটিয়াবাদ অক্ষুন্ন রাখতে এবং সেই সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্বার্থে উন্নয়ন কৌশল হিসাবে 'Culture system' চালু করে। সরকারের শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি সফল হয় বটে, কিন্তু এ ব্যবস্থার শোষন, অনিয়ম অবিচারের কারণে দ্বীপপুঞ্জে যেমন তেমন খোদ হল্যান্ডেও এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফলে ব্যবস্থাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। উনিশ শতকের শেষদিকে হল্যান্ডের নব্য বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের শিল্প পুঁজির বিকাশের স্বার্থে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও প্রগতি বিরোধী বাণিজ্যতান্ত্রিক একচেটিয়াবাদী 'Culture system' এর পরিসমাপ্তি ঘটায়। মুক্তবাজার নীতির জয়।

খ্রিষ্টীয় একাদশ শতক হতে লাতিন ইউরাপে যে রূপান্তর ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সুচনা হয়–তা পনের ও ষোল শতকের যুগপৎ রেনেসাঁস (Renaissance), ধর্মীয় সংস্কার (Reformation), পুনরুত্থানবাদ (Revivalism) এবং সর্বোপরি ভৌগলিক আবিস্ক্রিয়া (Geographical Exploration) আন্দোলনের মাধ্যমে অব্যাহত থাকে। এসব অভুতপূর্ব ঘটনার ফলে নবতর বাণিজ্যতন্ত্রের বিকাশ ঘটে এবং সতের শতকে বিশ্ববাণিজ্য বিপ্লব সংঘটিত হয়। এসব ঐতিহাসিক বিকাশের পরিণতিতে আঠারো শতকের শেষ এবং বিশেষ করে উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে ইউরোপে শিল্প ও কৃষি বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই রূপান্তরের সময় ইউরোপে

---

* প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মতাদর্শগত বির্তক খুবই চিত্তাকর্ষক। এ সময় উৎপাদন ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তনের ফলে ইউরোপের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মৌলিক রূপান্তর ঘটে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া বণিকতন্ত্রের স্থলে ইউরোপে গতিশীল ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নতুন সমাজ ব্যবস্থা গঠনে উদিয়মান সামাজিক শক্তি বুর্জোয়া শ্রেণী অগ্রণী ভুমিকা পালন করে।[১]

উপরোল্লিখিত সামাজিক রূপান্তরে ইউরোপের উদিয়মান শক্তি ইংল্যান্ড নেতৃত্ব দেয়। উদিয়মান ইংরেজদের মত ডাচ জাতি ষোল শতকের শেষ দিকে বিশ্ববাণিজ্যে প্রবেশ করে এবং সতের শতকের প্রথমার্দ্ধে প্রাচ্যের মশলা রাজ্য পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। উল্লেখ্য যে, ডাচদের মশলা রাজ্যে আগমনের পূর্বেই ইউরোপীয় আইবেরিয় উপদ্বীপের ছোট জাতি পর্তুগীজরা এ অঞ্চলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করে। অপুর্ব নৌ-শক্তির অধিকারী পর্তুগীজরা ইউরোপীয় জাতি সমূহের জন্য প্রাচ্যের দুয়ার উন্মুক্ত করার গৌরবের অধিকারী হলেও তারা মাত্র শতাব্দীতকাল (১৫১১-১৬৪১ খ্রিঃ) পর্যন্ত ভারত মহাসাগর তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়। সতের শতকে নবতর বাণিজ্যিক আদর্শ ও নৌশক্তি নিয়ে হল্যান্ডের ডাচ জাতি প্রাচ্যদেশ তথা দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায় আগমন করলে পর্তুগীজরা ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। পর্তুগীজদের বিতাড়িত করে হল্যাণ্ড পুর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে একটি একচেটিয়াবাদী বণিকতান্ত্রিক উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে তিন শতাব্দীব্যাপী আলোচ্য অঞ্চলে তাদের ঔপনিবেশিক শাসন অক্ষুন্ন থাকে। সুদীর্ঘকাল ব্যাপী শাসন-শোষনামলে (ঔপনিবেশিক স্বার্থে) ডাচরা বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে সৃষ্ঠ নতুন অবস্থার সাথে তাদের মূল আদর্শ 'বাণিজ্যতান্ত্রিক একচেটিয়াবাদ'কে খাপ খাওয়ানোর প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। এজন্য তারা তাদের উপনিবেশ পুর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের বাণিজ্য কৌশল অবলম্বন ও কৃষিনীতি গ্রহণ করে। তন্মধ্যে উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে তারা যে কৃষিনীতি ও কৃষি ব্যবস্থাটি অবলম্বন করে ডাচ-জাভা ইতিহাসে এটাই Culture System' নামে পরিচিত। হল্যান্ড ও জাভার ইতিহাসে বাঁক-পরিবর্তনে এটি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য যাত্রা বিন্দু। বক্ষমান প্রবন্ধটি এহেন গুরুত্ববাহী কৃষি ব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, এর উৎস, বিকাশ ও গতি-প্রকৃতি এবং উভয় দেশের উপর এর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার যথার্থ ও বস্তুনিষ্ট মূল্যায়নের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

ডাচদের ওলন্দাজ প্রবর্তিত আলোচ্য কৃষি ব্যবস্থাটির মুল ডাচ শব্দ 'Cultuur Stelsel'। এই মুল ডাচ শব্দটিকে Clive Day, J.S.Furnivall ও D.E.G. Hall প্রমুখ অনুবাদ করেছেন 'Culture System' রূপে।[২] B.H.M.Vlekee ও Ailsa Zainuddin এটাকে ভাল অনুবাদ বলে মনে করেন না।[৩] G.M.Kahin

মুল ডাচ কথাটির ইংরেজী অনুবাদ করেছেন 'Cultivation System' রূপে।[২] Vlekee ও Ailsa Zainuddin এই অনুবাদটিকেই সঠিক বলে মনে করেন। তাদের মতে, এটি Culture System অপেক্ষা অধিক অর্থবহ এবং যুক্তি সংগত।[৫] ইন্দোনেশিয়া ঐতিহাসিকগণ ডাচ কথাটির অনুবাদ করেছেন "Tanam Pakasa' রূপে। এর অর্থ বাধ্যতামুলক কৃষি কর্ম সম্পাদন ব্যবস্থা (Compulsory Planting)। এই ইন্দোনেশিয়া অনুবাদটির মধ্যে ওলন্দাজ শব্দ 'Cultuur Stelsel' এর সব অনুসংগ বিধৃত হতে পারে বলে আইলসা মনে করেন।[৩] সে যাহোক উপরোল্লেখিত বির্তক থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য প্রবন্ধে ওলন্দাজ সরকার প্রবর্তিত কৃষি ব্যবস্থা Culture Stelsel কে Culture System হিসাবে ব্যবহার করা হবে। কেননা ইতোমধ্যেই ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের কল্যাণে পন্ডিত মহল ও সাধারণ্যে এই কথাটিই ব্যাপক পরিচিত ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

প্রবন্ধের প্রস্তাবনা অনুযায়ী প্রথমেই 'Culture System' প্রবর্তনের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তবে এর পূর্বেই দ্বীপুঞ্জের ডাচদের আগমন ইতিহাস সংক্ষেপে উল্লেখ করা দরকার। স্মরণ করা আবশ্যক যে, পনের শতকের শেষার্দ্ধে ভুমধ্য সাগরে উসমানী সাম্রাজ্যের প্রভাব বলয় সম্প্রসারিত হওয়ায় ভুমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য আটলান্টিক উপকুলে স্থানান্তরিত হয় এবং পর্তুগীজদের নেতৃত্বে লিসবন প্রাচ্য মশলার ইউরোপীয় আন্তর্জাতিক বাজারে পরিণত হয়।[৭] হল্যান্ড ইউরোপের একটি ছোট, কিন্তু সাহসী ও উদ্যমী দেশ। ১৫৬৮ সালে ক্যাথলিক স্পেনের শাসন ও শোষন হতে হল্যান্ড জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করে এবং লিসবন বন্দর হতে প্রাচ্যের মরিচ ও মশলা সংগ্রহ করে উত্তর ইউরোপের দেশে দেশে বিক্রি করে হল্যান্ড তার সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে থাকে।

১৫৮০ সালে স্পেনের রাজা ফিলিপ পর্তুগাল দখল করে ডাচ বণিকদের লিসবনে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ১৫৯৪ সাল থেকে নিষেধাজ্ঞাটি কড়াকড়ি ভাবে প্রয়োগ করায় বেঁচে থাকার তাগিদেই ওলন্দাজরা (ডাচ) বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে মশলা রাজ্যে পৌছার চেষ্টা চালায়। কখনো ম্যাজিলান প্রণালী হয়ে, কখনো বা আফ্রিকা ঘুরে অবেশেষ ১৫৯৯ সালে উত্তমাশা অন্তরীপ-সুন্দা প্রণালী হয়ে তারা মশলা রাজ্যে প্রবেশ করে। উত্তর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে মশলা ব্যবসার প্রচুর সম্ভবনা দেখে মশলা ব্যবসা পরিচালনার জন্য হল্যান্ডে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট কোম্পানী গড়ে ওঠে। ১৬০১ সালের মধ্যে তারা পৃথক পৃথকভাবে মশলা দ্বীপে আগমন করে। পর্তুগীজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোকাবিলা করে পশ্চিম জাভার মরিচ বাজার বানতামে তারা তাদের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে। টারনেটেও তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬০২ সালে পুর্তগীজদের সাথে

সংঘটিত নৌ-যুদ্ধে জয় লাভ করে ওলন্দাজ জাতি জাভা সাগরে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ওলান্দাজ জাতি ছিল মুলত রেনেসাঁস উজ্জিবিত। তারা তাদের অস্তিত্বের সংগ্রামে কেবল বাণিজ্য ব্যাপদেশে প্রাচ্যে আগমন করে। কিন্তু তাদের বাণিজ্য বিস্তারে প্রবল বাধা ছিল নিজেদের মধ্যকার বাণিজ্য দলগুলোর পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। এমতাবস্থায় তারা বাণিজ্য বাধা অপসারনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলোকে একত্রিত করে ইংরেজদের অনুকরণে ১৬০২ সালে 'ওলন্দাজ সংযুক্ত পুর্ব-ভারতীয় কোম্পানী'--V.O.C (Verenigde Ostindische Compagnie) গঠন করে।[৮] এভাবে ওলন্দাজরাও ইংরেজদের মত ইউরোপের উদিয়মান বাণিজ্যতান্ত্রিক একচেটিয়াবাদী নীতি গ্রহণ করে। ইংল্যাণ্ডের টিউটর রানী এলিজাবেথের ন্যায় ডাচ সরকারও বৃহদায়তনের বিশ্ববাণিজ্যের বিকাশের জন্য ভি.ও.সি কে সামরিক, কুটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনী সমর্থন দেয় এবং প্রাচ্যদেশ সমুহে কোম্পানীকে বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে।

সংগঠিত ইউরো-এশীয় (Euro-Asia), আন্তঃএশীয় (Inter-Asian) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচলনার জন্য ওলন্দাজরা সুন্দাকল্প জয় করে তার নামকরণ করে বাটাভিয়া (আধুনিক জার্কাতা)। বাটাভিয়া প্রতিষ্ঠার পর হতে নিয়মিতভাবে মসলা ব্যবসায়ের উপর তাদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার সফল প্রচেষ্টা চলে। এই উদ্দেশ্যে ১৬২০-১৬৫০ সালের মধ্যে মশলা দ্বীপের প্রতিটি শক্তিকে পরাভুত করা হয়। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পর্তুগীজদের পতন হয় এবং তাদের সহযোগী ইংরেজদেরকেও সুকৌশলে মশলা দ্বীপ হতে বিতাড়িত করা হয়। অতঃপর আচেহ, মাকাসসার, মাতারাম এবং বানতাম অধিকারের মধ্যদিয়ে আঠারো শতকের প্রথম দিকে ডাচেরা সমগ্র দ্বীপপুঞ্জে সর্ব শ্রেষ্ঠ নৌ-শক্তিতে পরিণত হয়।[৯] উল্লেখ করা আবশ্যক যে, উদিয়মান ইউরোপীয় বাণিজ্যতন্ত্রের প্রতিনিধি সনদ প্রাপ্ত ভি.ও.সি ইউরো-এশীয় ও আন্তঃএশীয় বাণিজ্য পরিচালনার সাথে হল্যান্ড সরকারের পক্ষে নব বিজিত পুর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের শাসনভারও গ্রহণ করে। বাটাভিয়া হয় তাদের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের রাজধানী।[১০] বস্তুতঃ ভি.ও.সি. ছিল বিশ্বের প্রথম ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠাতা। ভি ও সি তাদের বিশ্ব বাণিজ্য পরিচালনার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যিক কার্যালয় বা ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করে। বাংলায় বাণিজ্য পরিচালনার জন্য তাদের প্রধান ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করা হয় হুগলিতে। এসব ফ্যাক্টরি পরিচালনার জন্য গড়ে তোলা হয় বিস্তারিত বাণিজ্যিক প্রশাসনিক কাঠামো।[১১]

এত সাফল্য সত্ত্বেও সতের শতকের শেষ দিকেই ডাচ কোম্পানীর বাণিজ্যে ভাটা পড়ে এবং আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশকে আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহের

ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়ায় তাদের অবক্ষয় দেখা দেয়। বস্তুতঃ এই সময় হতে বহুমুখি বিশ্ববাজারের বিকাশ ঘটে, বিশ্ববাজারে মশলার চাহিদা প্রচন্ডভাবে হ্রাস পায়। অথচ তথ্য বিবরণীতে দেখা যায় যে, সতের শতকের কয়েক দশক ধরে তাদের লভ্যাংশের সিংহভাগ আসে মশলা ব্যবসা হতে। এরূপ পরিবর্তিত বাস্তব অবস্থায় ডাচ কোম্পানী সরকারকে তার মুল অবস্থান পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিস্থিতিতে কোম্পানী (ক) ১৭৮৪ সালে প্যারিস চুক্তি অনুসারে সমগ্র দ্বীপপুঞ্জে অবাধ বাণিজ্য নীতির স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় (খ) বিশ্ব বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য ডাচরা জাভায় তামাক, কফি ও চা চাষের উপর নির্ভরশীল হয়।[১২] এভাবে ডাচরা একটি নৌ-শক্তি হতে স্থল শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স নৌ-শক্তিতে ডাচদের স্থান দখল করতে থাকে।

স্থল শক্তি হিসাবে নিজ স্বার্থেই ডাচদেরকে জাভায় উপযুক্ত ভুমিনীতি ও ভুমি ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করতে হয়। এ পর্যায়ে তারা প্রথমেই Contingency ও Forced delivery System চালু করে।[১৩] কিন্তু এই ব্যবস্থা কোম্পানীর অর্থনৈতিক মন্দারোধ করতে পারেনি। আঠারো শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে ডাচদের দ্বীপপুঞ্জে নানাবিধ সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। এই সময় জাভার দ্বিতীয় ও তৃতীয় উত্তরাধিকার সংগ্রাম এবং চীনা সমস্যা কোম্পানী সরকারের অবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এমতাবস্থায় কোম্পানীর গভর্ণর জেনারেল ভেলকিনায়ার (Valkinier) ও Van Imhoff প্রমুখ কোম্পানীর বিপর্যয় রোধ করে তাদের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য যে সব পদক্ষেপ নেন তার সবগুলোই ব্যর্থ হয়। আঠারো শতকের শেষ নাগাদ কোম্পানী বিপুল ঋণভারে নুব্জ হয়ে পড়ে এবং ১৭৯৮ খ্রিঃ ডাচ কোম্পানী সরকার দেউলিয়াত্বের দ্বার প্রান্তে উপনীত হলে হল্যান্ডের রাজ সরকার ভি.ও. সির পুরো দায়িত্ব গ্রহণ করে। ফলে ১৭৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর হতে জাভায় সরাসরি ডাচ ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হয়।[১৪] এ সময় হতে পুর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হল্যান্ড সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

জাভায় কোম্পানী শাসনের পরিবর্তে ডাচ সরকারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এখানে ডাচনীতি কি হবে-এ প্রশ্নে হল্যান্ডে বির্তক দেখা দেয়। এমতপরিস্থিতিতে ১৮০৮ সালে Hermn Williem Daendels গভর্ণর জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নতুন গভর্ণর উপনিবেশের আইন ও শাসন কাঠামোতে কিছু সংস্কার সাধন করেন বটে, তবে ভুমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পুর্ব প্রবর্তিত 'Forced delivery system' বা 'বাধ্যতামুলক পণ্য সরবরাহ নীতি' অব্যাহত রাখার পক্ষে মত দেন। সমগ্র মুনাফা রাষ্ট্রের প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে বাধ্যতামূলক পণ্য সরবরাহ নীতি অক্ষুন্ন রাখার যৌক্তিকতা তুলে ধরে হল্যান্ডের উপনিবেশ মন্ত্রীর কাছে তিনি পত্র লিখেন।[১৫] শুধু তাই নয়, তিনি স্থানীয় রাজাদের শাসিত

অঞ্চল (Territory of the Princes) ব্যতীত জাভার সমগ্র ভু-সম্পত্তিকেও সরকারের আয়ত্বাধীন বলে মনে করতেন এবং সেই অধিকারে এই সম্পত্তি ইউরোপীয়দের মাঝে বিক্রির ব্যবস্থা করেন। এতে প্রতিয়মান হয় যে, সে সময়ও বূর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ যথেষ্ট না হওয়ায় সামন্ততান্ত্রিক বণিকতন্ত্রী ডাচ সরকার জাভাবাসীদের ভুমি বাজার হতে দুরে রেখে তাদের একচেটিয়া বাণিজ্যতন্ত্র দৃঢ় রাখতে বদ্ধ পরিকর ছিল।

১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের পর আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমুল পরিবর্তন সূচিত হয়। এই সময় ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এই সুযোগে ফ্রান্স হল্যান্ড দখল করে নেয়। এমতাবস্থায় পুর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলে ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রিটিশদের নীতি ও কার্যক্রমের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। পুর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ ডাচ সামরিক ঘাঁটি সমূহ ফরাসীদের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত রাখাই হয় ইংরেজদের মুখ্যনীতি। এলক্ষ্যে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গুরুত্বপুর্ণ স্থান সমূহ ক্রমান্বয়ে ইংরেজরা দখল করে নেয়। ১৮১১ সালে জাভাও ব্রিটিশ করায়ত্ব হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে জাভায় নিয়োগকৃত গভর্ণর S.T. Raffles সেখানকার প্রশাসন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেন। ভুমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে Compulsory Service, Contingencies ও Forced delivery কে তিনি সেকেলে অমানবিক সামন্ত শোষন বলে মনে করতেন। তাই এই ব্যবস্থা বাতিল করে কৃষকদের স্বাধীনভাবে চাষাবাদ, পন্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের স্বাধীনতা দেন। তবে ইউরোপীয় প্রগতিশীল মুক্ত বাজার আদর্শে প্রভাবিত Raffles ভুমির উপর সরকারের মালিকানা স্বীকার করে নির্দেশ জারি করেন যে, কৃষকদের নিকট থেকে রাষ্টের খাজনা আদায় করার অধিকার আছে। তিনি জমির মুল্যের ভিত্তিতে খাজনা ধার্য করেন- যার পরিমাণ ছিল উৎপন্ন ফসলের এক চতুর্থাংশ থেকে অর্ধাংশ পর্যন্ত।[৮] Hall এর তথ্য অনুযায়ী গড়পড়তা এর পরিমাণ ছিল এক পঞ্চমাংশ। নগদে অথবা পণ্য আকারে খাজনা পরিশোধ করা যেত। নীতিগত দিক থেকে Raffles এর কর ধার্য ব্যবস্থা ডাচদের 'বাধ্যতামুলক পণ্য সরবরাহ নীতি' অপেক্ষা কৃষকদের জন্য কল্যাণকর মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে এটিও ছিল একটি নিবর্তন মুলক ব্যবস্থা। তবে এ ব্যবস্থাটিও কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি।

১৮১৩ খ্রিঃ লেইপজিগে (Leipzig) নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর হল্যান্ড পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে। বেলজিয়াম ও হল্যান্ড পুনরায় একত্রিত হয়। অরেঞ্জীয় ৬ষ্ঠ উইলিয়াম (The Prince of Orange William VI) হল্যান্ডের সার্বভৌম শাসক হিসাবে সিংহাসনে আরোহন করেন। লন্ডন চুক্তি অনুযায়ী ১৮১৪ সালের পর ইংল্যান্ড কর্তৃক দখলকৃত ওলন্দাজ উপনিবেশগুলো হল্যান্ডকে প্রত্যাবর্তন করা হয়। ১৮১৬ সালের ১৯শে আগষ্ট জাভায় ওলন্দাজ শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা উইলিয়াম যুদ্ধ বিধ্বস্ত হল্যাডের অর্থনীতি পুনর্গঠনে সচেষ্ট

হন; এবং অপুর্ব অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় পুর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে অর্থ আহরণ করে সে অর্থের মাধ্যমে হল্যান্ডের জাতীয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধার করার প্রয়োজনীয় উপায় উদ্ভাবনের পদক্ষেপ নেন।

লন্ডন চুক্তি অনুযায়ী দ্বীপপুঞ্জের হস্তান্তর প্রক্রিয়া তদারক এবং তথায় নতুন শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাজা ইউলিয়াম ১৮১৬ সালে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি 'কমিশনারস্ জেনারেল' নিয়োগ করেন।[১৭] স্বদেশ ও উপনিবেশে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা এবং দ্বীপপুঞ্জের জনগণের মধ্যে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ পুনঃ প্রতিষ্ঠা-এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সামনে রেখে ওলন্দাজ প্রশাসনকে কর্ম- উদ্যোগ গ্রহণ কত্তে হয়।[১৮] বস্তুত র‍্যাফেলস্বের উদার নীতির ফলে জাভায় ওলন্দাজদের অর্থনৈতিক ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধিকাংশই ব্রিটিশ ও আমেরিকার বিনিয়োগকারীদের হাতে চলে যায়। উপরুন্ত ইউরোপের বাজারে রপ্তানী যোগ্য কৃষি পণ্যের চাষ মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সময় ডাচদের পক্ষে তাদের উপনিবেশে পুনরায় বাধ্যতামুলক পণ্য সরবরাহ নীতি প্রবর্তন করা সম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় দায়িত্ব প্রাপ্ত 'কমিশনারর্স জেনারেল' র‍্যাফেলস্বের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জাভায় বাধ্যতা মুলক পণ্য সরবরাহ নীতির পরিবর্তে কৃষকদের অবাধ চাষাবাদের অধিকার দান করে তাদের কাছ থেকে গ্রাম ভিত্তিক ভুমিকর আদায়ের নীতি পুনঃ প্রবর্তন করেন। কিন্তু তাদের এই ব্যবস্থাটি ছিল ত্রুটিপুর্ন। জমির নিখুত জরিপ ও উৎপাদিকা শক্তির মূল্যায়ন সম্ভব না হওয়ায় প্রবর্তিত ব্যবস্থায় খাজনা ধার্যের কোন মানদন্ড ছিল না। প্রাপ্ত তথ্য মতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ছিল গড় পড়তা দুই পঞ্চমাংশেরও নীচে। দ্বীপপুঞ্জের বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় আনলে নিঃসন্দেহে খাজনার এই পরিমাণটি ছিল নীপিড়নমুলক।

১৮১৯ সালে পুর্বোক্ত কমিশনারস্ জেনারেলের দায়িত্ব শেষ হলে এর দুজন সদস্য দেশে ফিরে যান। অপর সদস্য Verder Capellen কে দ্বীপপুঞ্জে গভর্ণর করা হয়। তিনি এমন এক সময় দায়িত্ব লাভ করেন যখন হল্যান্ড ও তার উপনিবেশ জাভার আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। J.F.Cady উল্লেখ করেছেন, আলোচ্য সময়ে হল্যান্ড সরকার ঋণে হাবুডুবু খাচ্ছিল, শিল্প ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ড শুরু করার জন্য দেশে ব্যক্তিগত পুঁজির ছিল প্রচন্ড অভাব, হল্যাণ্ডের শহুরে জনতার অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়; তাদের প্রায় এক সপ্তমাংশ সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল ছিল।[১৯] এই সময় দ্বীপপুঞ্জেও আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা বিরাজমান ছিল। এমতাবস্থায় গভর্ণর Capellen এর পক্ষে উপনিবেশের পুনর্গঠন কাজটি ছিল সত্যিই দুরূহ। তাছাড়া তিনি ছিলেন তার সহকর্মীদের তুলনায় প্রগতি বিমুখ (Less Progressive) ব্যক্তি। কার্যকালে (১৮১৯-২৫ খ্রিঃ) তিনি এমন কতগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন-যা হল্যান্ড অথবা

ঔপনিবেশ দ্বীপপুঞ্জের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনে কোন ভূমিকা তো রাখেই নি, বরং সেখানে ভয়াবহ অস্থির অবস্থার সৃষ্টি করে। দ্বীপপুঞ্জে তিনি স্থানীয় প্রধানদের শক্তি বৃদ্ধি এবং সরাসরি সামন্ত নিয়ন্ত্রন চালু করেন, বেতনভুক্ত দেশীয় কর্মকর্তাদের ব্যবসা হতে বিরত রাখেন, প্রিঙ্গঁরে বাধ্যতামুলক কফি চাষ অক্ষুন্ন রাখার জন্য সেখানে ইউরোপীয় ও চীনাদের বসবাস অনুমতি বাতিল করেন, এবং প্রচলিত ভূমি রায়তি চুক্তি (Contracts of Land Tenancy) অনুসারে দেশীয় ভুস্বামীদের নিকট থেকে ইউরোপীয় ও চীনাদের ভূমি লীজ গ্রহণের অধিকার বাতিল করেন।[২০] Capellen কর্তৃক বাতিলকৃত শেষোক্ত ভূমিসত্ব চুক্তির আওতায় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ এতে খুবই অসন্তোষ্টি হয় এবং জোক-জাকার্তায় তা প্রবল আকার ধারণ করে। দিপো-নিগ্রোর (Dipo-Nigro) নেতৃত্বে ওলন্দাজ বিরোধী প্রচন্ড বিদ্রোহ শুরু হয়। ১৮২৫-৩০ সাল ব্যাপী পরিব্যাপ্ত এই বিদ্রোহ জাভা যুদ্ধ নামে পরিচিত।[২১] দ্বীপপুঞ্জের নতুন শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত উন্নয়নে আর্থিক ব্যয় এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি কারণে এই সময় সরকারের রাজস্ব ঘাটতি দেখা দেয়। এই আর্থিক সংকট মোকাবেলার জন্য সরকার কর্মচারী ছাঁটাই নীতি গ্রহণ করলে বিভিন্ন স্থানে প্রচন্ড গোলযোগ দেখা দেয়। এমতাবস্থায় আর্থিক সংকট লাঘবের উদ্দেশ্যে Capellen জাভার রাজস্ব বন্ধক রেখে কলিকাতার ব্যাংকিং হাউজ Palmer & Company হতে ২০ মিঃ গিল্ডার ঋণ গ্রহণ কতে বাধ্য হন।[২২] ওলন্দাজ অর্থনৈতিক অচলায়তন নিরসন কল্পে রাজা উইলিয়ামের সক্রিয় অংশিদারীত্বে ৩৭ মিঃ গিল্ডার মুলধন নিয়ে 'Netherlands Trading Society' (Netherlandsche Hendelmaats Chappiy) গঠন করা হয়। এতে শেয়ার মালিকদের জন্য ৪.৫% (Cady, 4.25% P. 354) লভ্যাংশ নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হল্যান্ডের আর্থিক বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব হয়নি।

১৮২৫ সালে দ্বীপপুঞ্জের সমস্যা সমাধানের ব্যর্থতার দায়ভার নিয়ে Capellen বরখাস্ত হন। Du Bus de Gisignise কে নতুন গভর্ণর নিয়োগ করা হয়। ঔপনিবেশিক শাসনের ব্যয়ভার হ্রাস এবং জাভাকে লাভজনক উপনিবেশ রূপে গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়ে তাকে জাভায় পাঠানো হয়। তার দায়িত্ব গ্রহণ লগ্নে জাভা যুদ্ধের অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। যুদ্ধ মোকাবিলায় সরকারের ২০-২৫ মিঃ ফ্লোরেন ঘাটতি হয়।[২৩] এ অবস্থায় Gisignies এর পক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন সম্ভব ছিলনা। তবে তিনি প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন। তাছাড়া তিনি Capellen কর্তৃক প্রবর্তিত ভূমি রেহান নিষেধাজ্ঞা (Prohibation of the Land Lease Contracts) বাতিল করেন। ১৮২৭ সালে Colonisation Report এর তিনি জাভার অব্যবহৃত জমি ইউরোপীয়দের হাতে বিক্রি অথবা লীজ দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তার প্রস্তাবনা

অনুযায়ী, জাভার কৃষকদের সাহায্যে ইউরোপীয়রা জমি চাষাবাদ করবে। এজন্য কৃষকরা চুক্তিমত মজুরী পাবে। তার এই প্রস্তাব উদার অর্থনীতির সুত্রের উপর নির্ভরশীল হলেও এতে জাভানীদের আর্থিক মুক্তির সুযোগ ছিল না। কেননা এতে আর্থিক উদ্যোগের দায়িত্ব ইউরোপীয়দের হাতেই ন্যাস্ত ছিল। উল্লেখ্য যে, Gesignies এর গৃহীত ব্যবস্থাবলীর সুফল প্রাপ্তির পূর্বেই হল্যান্ডের জন্য মারাত্মক বিপর্যয় আসে। ১৮৩০ সালে হল্যান্ড হতে বেলজিয়াম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই ঘটনাটি হল্যান্ডের জাতীয় অর্থনীতি পুণর্গঠনের কর্মউদ্যোগকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। হল্যান্ডের পরিকল্পিত শিল্প উদ্যোগ ব্যাহত হয়। ঋণভারে জর্জরিত হল্যান্ড দেওলিয়াত্বের দ্বার দেশে উপনীত হয়।

স্বদেশ ও উপনিবেশের উপরিউক্ত নাজুক পরিস্থিতিতে ওলন্দাজ সম্রাট জাভায় বাস্তব অবস্থার মুল্যায়ন এবং সমস্যাসমুহের সম্ভাব্য সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে Johanes Ven Den Bosch কে দ্বীপপুঞ্জে প্রেরণ করেন। ওয়েষ্ট ইন্ডিজে দাস শ্রমে অভিজ্ঞ বশ (Bosch) এক বছর পর একটি প্রতিবেদন তৈরী করে তা বিবেচনার জন্য সরকারের কাছে প্রেরণ করেন। প্রতিবেদনে তিনি জমির উৎপন্ন ফসলে জাভানীদের অবাধ ভোগ দখলের অধিকার এবং অব্যবহৃত পতিত জমি ইউরোপীয়দের কাছে বিক্রয়- এই দুই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ইউরোপীয় বাজারের বিক্রয় উপযোগী পণ্য জাভায় উৎপন্নের কথা বলেন। তিনি সম্রাটকে নিশ্চয়তা দেন যে, উপনিবেশে রপ্তানী পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে ওলন্দাজ খাজাঞ্চি খানায় বছরে ২০ মিঃ গিল্ডার অর্থ জমা করা সম্ভব হবে।[২৪] তার এই প্রস্তাব আর্থিক সংকটে নিপতিত ওলন্দাজ সরকারের মনোপুত হয়। ১৮৩০ সালে হল্যান্ড সম্রাট বশকে গভর্ণর জেনারেল করে জাভায় প্রেরণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণ করে বশ তার পূর্ব প্রস্তাব অনুযায়ী জাভায় একটি নতুন কৃষিনীতি প্রবর্তন করেন। এই কৃষিনীতির মুল কথা হল, 'উপনিবেশের কৃষকরা সরকারের নিদের্শমত ইউরোপের বাজারের চাহিদা মোতাবেক বাধ্যতামুলকভাবে নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদন করবে এবং তাদের উপর ধার্যকৃত ভুমি খাজনা ও করের পরিবর্তে উৎপন্ন পন্য বাধ্যতামুলক ভাবে সরকারের কাছে সরবরাহ করবে। বশের প্রবর্তিত এই কৃষি ব্যবস্থাটিই মুল ডাচ ভাষায় Cultuur Stelsel এবং ইংরেজী ভাষায় 'Cultivation System' বা 'Culture System' নামে পরিচিত।

প্রস্তাবিত নতুন কৃষি ব্যবস্থাটি কার্যকরী করার জন্য বশ কতগুলো নীতিমালা প্রণয়ন করেন। (উপনিবেশের কৃষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) এ সব নীতি-মালার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

১. ইউরোপীয় বাজারের চাহিদা অনুযায়ী কৃষি পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে জাভার আবাদী ক্ষেত্রের একটি অংশ নির্ধারিত রাখার জন্য কৃষকদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করা;

২. প্রতিটি গ্রামের (Desa) আবাদযোগ্য জমির এক পঞ্চমাংশ কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য আলাদা করে রাখা;

৩. সরকার নির্ধারিত কৃষি পণ্য উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রম ধান চাষের জন্য ব্যয়িত শ্রম অপেক্ষা বেশী হবে না;

৪. সরকারী কৃষি পন্য উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত ভুমি কৃষিকর মুক্ত রাখা হবে;

৫. উৎপন্ন কৃষি পন্য কৃষককে জেলা কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করতে হবে। প্রেরিত ফসলের নিরুপিত মূল্য যদি পুরনো ধার্যকৃত ভুমি খাজনা অপেক্ষা বেশী হয়, তবে উদ্বৃত্তাংশ গ্রাম সমাজকে প্রত্যার্পন করা হবে;

৬. কৃষকদের কার্যতৎপরতার অভাব বা ইচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতি না থাকলে ফসল না হওয়া বা বিনষ্ট হওয়ার দায়-দায়িত্ব বর্তাবে সরকারের উপর, কৃষকের উপর নয়;

৭. কৃষকরা তাদের সমাজপতিদের নির্দেশে কাজ করবে। এক্ষেত্রে ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের তদারকি (Supervision) ফসল কাটা, সময় মত পরিবহন ও ফসল সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান নির্বাচনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে;

৮. শ্রমিকদের একাংশের দায়িত্ব হবে ক্ষেত্র পরিচর্যা, এক দলের শস্য তোলা, একদলের পরিবহন এবং একদলের কারখানায় কাজ করা;

৯. কালচার নীতির বাস্তব প্রয়োগে (Practical Application) কোন অসুবিধা দেখা দিলে কৃষকদের ভুমিকর না দেয়ার স্বাধীনতা থাকবে। তখন ধরে নেয়া হবে ফসল পাকলেই তাদের দায়-দায়িত্ব শেষ হয়েছে। এক্ষত্রে আনুসংগিক অন্যান্য কাজগুলো সম্পাদনের জন্য স্বতন্ত্র চুক্তির প্রয়োজন হবে, ইত্যাদি।

বঙ্গের নতুন কৃষি ব্যবস্থার উপরোক্ত নীতিমালা সমুহ D.E.G.Hall তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। Hall দাবী করেছেন তার উল্লেখিত নীতিমালার উৎস ওলন্দাজ পন্ডিত Colenbrander এর Indisch Staatsblad' গ্রন্থ।[২৫] Clive Day, J.S. Furnivall প্রমুখের বিবরণীতেও উপরোক্ত নীতিমালা সমুহের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৬]

জাভা যুদ্ধ পরবর্তি অত্যন্ত অনুকুল পরিবেশে বঙ্গের নতুন কৃষি ব্যবস্থা চালু করা হয়।[২৭] সরকারী নির্দেশে রেসিডেন্টগণ (Resident) তাদের অধীনস্থ রিজেন্ট

(Regent. দেশীয় সহযোগী) গ্রাম ও গোত্র প্রধানদের এক সম্মেলনে আহ্বান জানিয়ে সমগ্র ব্যবস্থাটি ব্যাখ্যা করেন। নির্দিষ্ট হারে কৃষকদের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে তা নির্ধারিত মুল্যে সরকারের কাছে সরবরাহের জন্য ইউরোপীয় ও চীনাদের সাথে স্বতন্ত্র চুক্তি করে তাদেরকে সরকারী ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে নূতন ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট করা হয়।[২৮]

প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কার্যাদি সম্পাদনের পর বশ্চ প্রথমে নীল, ইক্ষু এবং কফি চাষের মাধ্যমে নতুন কৃষিনীতির বাস্তবায়ন সুচনা করেন। প্রথম পর্যায়ে ব্যবস্থাটি সফল প্রতিপন্ন হলে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে চা, তামাক, মরিচ, দারুচিনি, সিনকোনা (এক প্রকার বৃক্ষ যার নির্যাস থেকে কুইনান তৈরী করা হয়) এবং আরো পরে কাসাভা (এক প্রকার বৃক্ষ-যার মুল খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়) এবং কচিনীল (Cochineal- এক ধরনের কীট) ইত্যাদি অর্থকরী ফসলকে কালচার ব্যবস্থার পণ্য তালিকাভুক্ত করা হয়। উল্লেখ যে, B.H.M.Vlekee কফিকে বাধ্যতামুলক কর্ষণ প্রথার তালিকাভুক্ত পণ্য বলে মনে করেন না। যদিও অধিকাংশ পন্ডিতের বর্ণনায় কফিকে বাধ্যতামুলক কষর্ণ সবচেয়ে লাভজনক পণ্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু Vlekee বলেন, কফি চাষ হত সরকারী খাস মহলে জনগণের ধানী জমিতে নয়। সেজন্য উৎপাদিত কফি কর হিসাবে বিবেচিত হতনা, জনগণও কর হিসাবে ইহা চাষ করত না।[২৯] আমাদের কাছে প্রাপ্ত অধিকাংশ পন্ডিতের বর্ননা এবং বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে Vlekee এর এই অভিমত যথাযথ বলে মনে হয় না। প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাধ্যতামুলক কর্ষন যুগে দ্বীপপুঞ্জে উপরোল্লেখিত যে সব কৃষি পণ্য চাষ শুরু হয়, এর অনেকগুলোর তাৎক্ষনিক ফল আশাব্যঞ্জক ছিল না। তবে পরবর্তী কালে উদারনৈতিক ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কাঠামো (Laissez Faire) প্রতিষ্ঠিত হলে এই সব নতুন ফসল দ্বীপপুঞ্জে সমৃদ্ধির সুচনা করে।[৩০]

অধ্যাপক মুসা আনসারী মনে করেন, কালচার সিষ্টেম ছিল একটি সম্ভাবনাময় শোষনমুলক বাণিজ্যভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা।[৩১] কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। কেননা এর প্রাথমিক প্রস্তাবনার সাথে প্রয়োগিক বাস্তবতার পার্থক্য ছিল বিস্তর। এই পার্থক্যের জন্য দায়ী অবশ্য সরকার নিজেই। বস্তুত এই ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সম্ভাব্য যে কোন বাধা অপসারনে ওলন্দাজ সরকার ছিল বদ্ধপরিকর। এজন্যই ১৮৩২ সালে গভর্ণর বশ্চকে নিরংকুশ স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এর পর থেকে প্রতিদিন এর বাস্তবায়নে বল প্রয়োগ বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবস্থার সুত্রায়নের সময় থেকে এর পুর্নাঙ্গ বাস্তবায়ন কালের মধ্যে হল্যান্ড হতে বেলজিয়ামের বিচ্ছিন্নতা এবং হল্যান্ডের উপর ইউরোপীয় যুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক চাপ সমগ্র পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং প্রেক্ষিত মৌলিকভাবে বদলে দেয়। ১৮৩১ সালে জাভার সর্বত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে ইক্ষু, নীল ও কফি চাষের নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৮৩২ সালে প্রতি রেসিডেন্সীতে

জন প্রতি দু'গিল্ডার পণ্য সরকারের নিকট সরবরাহ করা বাধ্যতামুলক করা হয়। এই নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবাধ্য গ্রাম প্রধান বা কৃষকদের দৈহিক নির্যাতনেরও (Corporal Punishment) ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৩৩ সালে প্রত্যেক কৃষককে সরকারকে দেয় কফি কোটার পর উদ্বৃত সমস্ত কফি নির্ধারিত মুল্যে সরকারের নিকট বিক্রয়ের নির্দেশ দেয়া হয়। এই নির্দেশ অবশ্যই পুর্ব প্রতিশ্রুত নিয়ম বিরোধী ছিল। কেননা মুল প্রস্তাবনায় কৃষককে নির্ধারিত এক পঞ্চমাংশ ভুমিতে সরকারী ফসল চাষের পর অবশিষ্ট ভুমিতে তার পছন্দমত ফসল চাষ এবং তা ইচ্ছামত বিক্রির অধিকার দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৮৩৩ সালের নির্দেশনায় কৃষকের পুর্বোক্ত অধিকার হরণ করে। উল্লেখ্য যে, এই নির্দেশের ফলে বেসরকারী পর্যায়ে কফি ব্যবসার ইতি ঘটে এবং এতে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়াবাদ (Monoply) প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩২] কালচার ব্যবস্থায় ধার্য ও আদায়কৃত ভুমিকর সম্পর্কে পন্ডিত মহলে বির্তক আছে। এ ব্যাপারে D.E.G. Hall উল্লেখ করেন, কৃষক কর্তৃক সরকারী পণ্য চাষের জন্য পৃথক করে রাখা এক পঞ্চমাংশ অংশ ভুমি ছিল কর মুক্ত (The Land set apart is free of Land rent)।[৩৩] Hall. এর বক্তব্যের উৎস Colenbrander এর Indisch Staatsblsd গ্রন্থ। আর Colenbrander বলেছেন তিনি এ তথ্য পেয়েছেন ডাচ রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিলে। জহর সেন মনে করেন, Colenbrander রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানা দলিলের মর্ম উদ্ধারে ব্যর্থ হয়েছেন। রাষ্ট্রীয় মহাফেজ খানার দলিলে নির্ধারিত এক পঞ্চমাংশ অংশ ভুমি কর মুক্ত রাখার কথা বলা হয়নি, বরং এতে বলা হয়েছে "যে দেশ-গ্রাম ধান চাষের জমির এক পঞ্চমাংশ রপ্তানীযোগ্য কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য সরিয়ে রাখবে, সেই দেশ বা গ্রাম সামগ্রিকভাবে ভুমি কর থেকে অব্যাহতি পাবে। এক্ষেত্রে যদি ধার্যকৃত ভুমিকর থেকে প্রদেয় শস্য মূল্য বেশী হয়, তবে উদ্বৃত মুল্য পাবে সেই দেশ বা গ্রাম।[৩৪] শেষোক্ত মন্তব্যের আলোকে এই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, জাভার কৃষকরা নতুন ব্যবস্থায় নির্ধারিত পরিমাণ জমি ও উৎপন্ন ফসল সরকারের হাতে প্রত্যার্পণ করে ভুমিকর প্রদানের দায় থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা হয়নি। বাস্তবে বাধ্যতামুলক কর্ষণ প্রথার সকল নিয়ম পালন সত্ত্বেও কৃষককে অতিরিক্ত ভুমিকর দিতে হত। Clive Day এর বর্ণনা মতে, কালচার ব্যবস্থা কৃষকদের উপর একটি দ্বৈত বোঝা আরোপ করে। কেননা বহু ক্ষেত্রে কৃষককে বাধ্যতামুলক পণ্য চাষ করতে হত। আবার তাকে ভুমি করও দিতে হত।[৩৫] G.M.Kahin, J.F. Cady, D.R. Sardesai প্রমুখের বিবরণীতেও Day - এর বক্তব্যের সমর্থন মেলে।

কালচার সিষ্টেমে কৃষককে কৃষি কর দিতে হত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এর পরিমাণ কত ছিল তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। প্রাপ্ত তথ্য মতে, কর নির্ধারনের কোন একক, সঠিক ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা হত না।

জাভায় একটি সাধারণ নিয়ম ছিল যে, উৎপন্ন ধানের মুল্যের উপর ভিত্তি করে কর ধার্য করা হত এবং গড় পড়তায় এর পরিমাণ ছিল ধানের মুল্যের এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু ১৮৩০ সালের পর ধানের মুল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় করের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। এক পর্যায়ে তা উৎপন্ন পণ্যের অর্ধাংশে উপনীত হয়। প্রসংগতঃ উল্লখ্য যে, মুল পরিকল্পনা মতে সরকারকে প্রদেয় পণ্যের নিরুপিত মুল্য নির্ধারিত ভুমি করের চেয়ে বেশী হলে অতিরিক্ত অংশ গ্রাম সমাজ পেত। কিন্তু দেয় পণ্যের মূল্য ধার্যকৃত কর অপেক্ষা কম হলে কৃষককে হয় অর্থ দিয়ে, নতুবা পণ্য দিয়ে কমতি অংশ সরকারকে পুরণ করে দিতে হত।[৩৬] এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, এক পঞ্চমাংশ ভুমিতে নির্ধারিত পণ্য চাষ ও সরবরাহ করলেই ভুমিকর থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেত না। কালচার সিস্টেমের এটি ছিল একটি বড় ধরণের ত্রুটি।

বাধ্যতামুলক চাষ ব্যবস্থায় রপ্তানী পণ্য উৎপাদনে দাবীকৃত প্রয়োজনীয় শ্রম সম্পর্কিত নীতিমালাটিও প্রথম থেকে ভঙ্গ করা হয়। মুল নীতিমালায় এ ব্যাপারে কৃষকদের কর্ম সময়ের (Working time) এক পঞ্চমাংশ ব্যয় করার কথা বলা হলেও বাস্তবে আদায়কৃত শ্রমের পরিমাণ ছিল অনেক বেশী। বস্তুত কফি, ইক্ষু ও নীল চাষে ধান চাষ অপেক্ষা অনেক বেশী শ্রম ব্যয়িত হত। বশ্চ সরকারী জমি চাষে কৃষকদের জন্য বছরে ৬০ দিন ধার্য করেন। কিন্তু কফি চাষ করতেই কৃষককে ব্যয় করতে হত বছরে ৯০ দিন। ইক্ষু চাষেও ধান চাষ অপেক্ষা দ্বিগুন সময় ব্যয় করতে হত কৃষককে। চিনি কলে কাজ করাও ছিল অত্যন্ত পরিশ্রম স্বাপেক্ষ ও ক্লান্তিকর। তবে কৃষকদের জন্য সবচেয়ে নিবর্তনমুলক ছিল নীল চাষ। এর জন্য কৃষককে মাসের পর মাস তাদের নিজ পরিবার থেকে দুরে সরিয়ে রাখা হত। এজন্যই কৃষকরা অনেক সময় নীল চাষভুক্ত এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র পালিয়ে যেত।[৩৭] সরকারী পণ্য উৎপাদনে অধিক শ্রম ব্যয় ছাড়াও কৃষকদের রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষণা-বেক্ষণ সহ সরকারী গণপুর্ত কর্মে বাধ্যতামুলক বেগার শ্রম দিতে হত। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, কৃষকদের কাছ থেকে শ্রম দাবী ও আদায়ের ক্ষেত্রে সবর্ত্র অভিন্ন নিয়ম ছিল না। কেননা এ ব্যবস্থায় কোন কোন অঞ্চলে কৃষকদের কেবল একটি সরকারী পণ্য, আবার কোথাও কোথাও দুই বা ততোধিক পণ্য উৎপাদন করতে হত। তাই শ্রম প্রদানেও অঞ্চল ভেদে ব্যাপক পার্থক্য দেখা দেয়। শুধু তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তারা সরকারী নীতিমালা উপেক্ষা করে নিজেদের খুশিমত শ্রম আদায় করতেন। Hall এর মতে ফলে কোন কোন স্থানে কৃষককে বছরে প্রায় ২০০ দিন, Clive Day এর মতে ২২৫ দিন এবং G. H. Vender Kolff এর মতে বছরে ২৪০ দিন বা তারও বেশী সরকারী কাজে শ্রম বিনিয়োগ করতে হত।[৩৮] উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এই ব্যবস্থায় কৃষককে নিজস্ব জমি চাষের পূর্বেই সরকারী পণ্য চাষে বাধ্য

করা হত। ফলে কৃষকের পক্ষে নিজের জন্য ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব হত না। এটাকি সনাতনী সামন্ততন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার আলামত নয় ?

কালচার সিষ্টেমের প্রস্তাবনা অনুযায়ী সরকারী পণ্য উৎপাদনের জন্য কৃষকের এক পঞ্চমাংশ অংশে আবাদী ভুমি নির্ধারণ করে রাখা ছিল বাধ্যতামুলক। কিন্তু বাস্তব চিত্র ছিল অন্য রকম। বাস্তবে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সময়ে জমি গ্রহণে ব্যাপক তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ কি? পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমগ্র কৃষি ব্যবস্থাটি তদারকির দায়িত্ব ছিল ইউরোপীয় ও তাদের সহযোগী স্থানীয় কর্মকর্তাদের উপর। Hall বলেন, তদারকির কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তারা কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ কমিশন পেতেন। তাই তারা কমিশন প্রাপ্তির প্রত্যাশায় যেনতেন প্রকারে বেশী পরিমাণে ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করতেন। এজন্য তারা কৃষকদের এক পঞ্চমাংশ থেকে অধিক জমি সরকারী ফসল চাষে বাধ্য করতেন।[৩৯] ফলে কখনো কখনো এর পরিমাণ আবাদী ভুমির এক তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ, এমন কি কখনো সেচ সুবিধা প্রাপ্ত সম্পুর্ন জমিই এই উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হত।[৪০]

নির্ধারিত পণ্য চাষে অনুপযোগী জমি নির্বাচন অথবা অন্য কোন কারণে উৎপাদন ব্যহত হলে এর ক্ষতির জন্য আলোচ্য ব্যবস্থায় কৃষকদের দায়ী করা হত।[৪১] এটি ছিল কালচার সিষ্টেমের একটি বড় ধরনের বিকৃতি এবং বশের মুল পরিকল্পনার পরিপন্থী। কেননা মুল প্রস্তাবনায় কৃষকের কর্মতৎপরতার অভাব বা ত্রুটি-বিচ্যুতি না থাকলে ফসল না হওয়া বা বিনষ্ঠ হওয়ার দায় ছিল সরকারের, কৃষকের নয়। কিন্তু বাস্তবে এর জন্য কৃষককেই দায়ী করা হয়। এটি ছিল একটি অন্যায়। এই হল জাভায় ডাচ সরকার প্রবর্তিত কালচার সিষ্টেমের বাস্তব রূপরেখা। আর একেই বলে সামন্ততান্ত্রিক বনিকতান্ত্রিক শোষন ব্যবস্থা।

কালচার সিষ্টেম প্রবর্তনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, এর মুল প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণার পর অন্য একটি বিষয়ের প্রতি নজর দেয়া আবশ্যক। ডাচদের স্বদেশে বা ওপনিবেশ জাভার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর কালচার সিষ্টেমের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কি ছিল? পন্ডিতদের মতে, বাধ্যতামুলক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে জাভার ভুমিতে বাণিজ্যতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। তবে এর দ্বারা ভুমি সংশ্লিষ্ট কৃষকদের অবস্থার কি কোন পরিবর্তন হয়েছিল? এর উত্তর, হয়নি। এর কারণ, অধ্যাপক মুসা আনসারী বলেন, 'ভুমিতে বিকশিত বাণিজ্যতন্ত্র প্রগতিশীল হতে পারেনি। দেশীয় জনতা ও স্থানীয় বণিক শ্রেনী স্বার্থে ঐ বাণিজ্যতন্ত্রের বিকাশ হয়নি, বরং ইহা হয়েছিল ঔপনিবেশিক স্বার্থে।'[৪২] কোন সন্দেহ নেই যে, কালচার ব্যবস্থার ফলে বিশ্ব বাজারের সংগে জাভার যোগাযোগ ঘটে। ডাচ সরকার ও ডাচ ট্রেডিং কোম্পানী জাভাকে বিশ্ব অর্থনীতির সংগে

গভীরভাবে যুক্ত করে। কিন্তু এ থেকে জাভার কৃষকরা কিছুই পায়নি। কেননা চাষাবাদ করত জাভার কৃষক, কিন্তু উৎপন্ন পণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাত করত বিদেশী ইউরোপীয় বণিক। ফলে জাভার উৎপাদক তার পণ্যের বাজারের সাথে কোন যোগাযোগ করতে না পারায় কাঙ্খিত লভ্যাংশ হতে সে বঞ্চিত হয়।[৫২] কালচার সিস্টেমের আওতায় ১৮৩০-৬০ সালের মধ্যে দ্বীপপুঞ্জের অনেকগুলো বিদেশী অর্থকরী ফসলের চাষ শুরু হয়। কোন কোন পণ্ডিত একে এই ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম সুফল (Most benificial result of the System) বলে অভিহিত করেছেন।[৫৩] কিন্তু নতুন নতুন ফসল চাষ প্রবর্তনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উপরের মন্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ একমত হওয়া যায় না। এ ব্যবস্থায় অনেক ফসল সরকারী চাষের তালিকাভূক্ত করা হয়- যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এর ফলে দ্বীপপুঞ্জে ধান চাষের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে পড়ে। এতে ধানের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় এর বাজার দর বৃদ্ধি পায়। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ১৮৪৩-৪৮ সাল পর্যন্ত জাভায় দুর্ভিক্ষ চলে। এ সময় পণ্য মূল্য পরিশোধ করার জন্য সরকার প্রচুর তাম্রমুদ্রা বাজারে ছাড়ে। এতে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়; কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় দুর্ভিক্ষ মহামারি অনিবার্য হয়ে ওঠে। খাদ্য দাঙ্গা ও কৃষক বিদ্রোহ জাভা সমাজের নিত্ত-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়। এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য সরকার কঠোর হস্তে দমন-নিপীড়ন শুরু করে। দূর্ভিক্ষ, মহামারি ও সরকারী দলননীতির ফলে বহু লোক প্রাণ হারায়। ১৮৪৩-৪৮ সালের মধ্যে দ্বীপপুঞ্জের একটি রিজেন্সীর জন সংখ্যা ৩৩৬,০০০ থেকে ২০,০০০ এবং অন্য একটি ৮৯,৫০০ থেকে ৯,০০০ নেমে আসে।[৫৪]

বস্তুতঃ জাভা তথা দ্বীপপুঞ্জের উপর কালচার নীতির অর্থনৈতিক প্রভাব ছিল নির্মম। তবে এর ফলে জাভার গ্রামীণ সমাজ ও শাসন কাঠামোতে পরিবর্তন দেখা দেয়। নতুন ব্যবস্থায় গ্রামীণ উচ্চবর্গ গ্রাম' প্রধান-প্রিয়ায়ী শ্রেণী ও ধর্মীয় শাস্ত্রী শ্রেণীর সামাজিক অবস্থান ও ক্ষমতা কাঠামোতে রূপান্তর ঘটে। বস্তুত সুদীর্ঘকাল ধরে জাভার সামাজিক নেতৃত্ব ছিল প্রিয়ায়ী শ্রেণীর হাতে। র‍্যাফেলস্ ও ড্যানড্যালস এর সময়ে তাদের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। কিন্তু বশের নতুন ব্যবস্থাধীনে তারা তাদের লুপ্ত গৌরব ফিরে পায়। কেননা বাধ্যতামূলক কৃষি ব্যবস্থা চালু করতে ডাচ সরকারকে জাভার ঐ নেতৃস্থানীয় উচ্চকোটির ব্যক্তিবর্গের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। দেশীয় শ্রমিকদের তত্ত্বাবধান ও পণ্য সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল তাদের হাতে। এতে স্বাভাবিক কারণেই তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর সংগে প্রিয়ায়ী শ্রেণী অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে পড়ে। নতুন কৃষিনীতির দ্বারা ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে জাভার উচ্চকোটির মানুষের অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিশ্চিত হয় । তাই প্রিয়ায়ী শ্রেণী ঔপনিবেশিক

শক্তির সামাজিক ভিত্তিতে পরিণত হয়। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই ব্যবস্থায় গ্রাম প্রধানদের প্রভাব ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু তাদের স্বাতন্ত্র ও মর্যাদা লুপ্ত হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে তারা সেখানকার ঐতিহ্যশ্রয়ী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এককালে গ্রাম প্রধান যেখানে ছিলেন গ্রামের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক, গ্রামের রক্ষক, নতুন ব্যবস্থায় সেখানে তারা ঔপনিবেশিক শোষণ ও নিপীড়ন যন্ত্রে পরিণত হন।[৮৫] এর ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষের মন থেকে তারা ধীরে ধীরে মুছে যান। এমতাবস্থায় মুসলিম ধর্মনেতা শাস্ত্রী শ্রেণী জাভা সমাজের নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

কালচার সিষ্টেম দ্বীপ-পুঞ্জের জনমানুষের জন্য কল্যাণকর ছিল না। কোন কোন পন্ডিত মন্তব্য করেছেন এর ফলে জাভা শ্মশানে পরিণত হয়। তবে ডাচ ঔপনিবেশিক শক্তির জন্য এটি ছিল আর্শীবাদ। এই ব্যবস্থার ফলে দ্বীপপুঞ্জ থেকে প্রাপ্ত সম্পদে হল্যান্ডের অর্থনৈতিক বিকাশ তরান্বিত হয়; সেখানে শিল্প ও কৃষি বিপ্লবের দ্বার উন্মুক্ত হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৮৩১খ্রিঃ মধ্যে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হল্যান্ডের রাজকোষে পুর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে ৮২৩,০০০,০০০ গিল্ডার অর্থ সংগৃহীত হয়।[৮৬] সংগৃহীত এই অর্থ দ্বারা ডাচ সরকার তার ঋণ পরিশোধ করে, বেলজিয়ামের সাথে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন এবং রেলপথ নির্মাণসহ অন্যান্য জনহিতকর কার্য সম্পাদন করে। B.H.M. Vlekee উল্লেখ করেছেন, এই সময় হল্যান্ডের বার্ষিক গড় বাজেটের ৬০ মিঃ গিল্ডারের মধ্যে প্রতিবছর পুর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে গড়ে ১৮ মিঃ গিল্ডার সংগৃহীত হত।[৮৭]

কালচার সিস্টেমের প্রভাবে ডাচ বাণিজ্য ও নৌযান শিল্পেও অগ্রগতি সুচিত হয়; 'The Nether Lands Trading Company' অবিশ্বাস্যভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করে। কোম্পানীর গঠন লগ্নে রাজা উইলিয়াম ব্যক্তিগত উদ্যোগ, মুলধন বিনিয়োগ ও উচ্চ লভ্যাংশ ঘোষণা করেও যেখানে কোম্পানীর অবস্থার পরিবর্তন করতে পারেননি, নতুন ব্যবস্থায় তাই সম্পন্ন হয়। এই সময় কোম্পানীর সাথে সরকারের স্বাক্ষরিত চুক্তি বলে হেগ-বাটাভিয়া পণ্য পরিবহন ঠিকাদারী পাওয়ায় ডাচ জাহাজ শিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটে। অল্প দিনের মধ্যেই ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পরই ওলন্দাজ বাণিজ্য জাহাজ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অবস্থানে উন্নীত হতে সক্ষম হয়।

বাধ্যতামুলক কৃষি ব্যবস্থা হল্যান্ডে সমাজ বিপ্লব সংগঠনে গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রাখে। বস্তুত নতুন ব্যবস্থায় বাণিজ্য ও পরিবহণ শিল্পের উন্নতির সংগে সংগে হল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়। আর শিল্প বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে হল্যান্ডের সমাজ বিপ্লব সাধিত হয়। এতে সেখানকার বাণিজ্যিক সামন্ত শ্রেণীর

ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সেখানে একটি শক্তিশালী বুর্জোয়া ও পাতি বুর্জোয় শ্রেণীর বিকাশ ঘটে।

জাভায় বশ্চ প্রবর্তিত কৃষি ব্যবস্থাটি ১৮৩০-৬০ সাল পর্যন্ত তিন দশক ধরে প্রায় অপ্রতিহত ভাবে কার্যকর ছিল। জাভা ও হল্যান্ডের উপর এ ব্যবস্থার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া যাই হোক এর মূল্যায়নে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত পার্থক্য বিস্তর; তৎকালীন হল্যান্ডের উদিয়মান বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীগণ এই ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, এর মাধ্যমে দ্বীপপুঞ্জ কিছুই পায়নি (The Indies gained nothing)।[৫১] ওলন্দাজ পন্ডিত S. Ven Deventer তার Bijdrafentot de Kennuis গ্রন্থে বশ্চ ব্যবস্থার অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি, অন্যায়, অসাম্য ও নিষ্ঠুরতার নিখুত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। Deventer এর অনুকরণে Ven Soet ও Clive Day প্রমুখ পন্ডিত কালচার সিস্টেম এর কঠোর সমালোচনা করেন। Robert V.Neil, কালচার ব্যবস্থার অধিকর্তা B.J.Elis, ও B.H.M. Vlekee প্রমুখ পন্ডিতগণও এই ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসংগতির প্রসংগ উপস্থাপন করেন। ঐ ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও নিষ্ঠুরতার জন্য তারা সরাসরি বশ্চকে দায়ী করেন; তাদের মতে বশ্চ ছিলেন সর্বপ্রকার উদারনীতির চরম শত্রু, মুর্তিমান শয়তান এবং জ্ঞানপাপী। তিনি জেনে শুনেই তার নীতি জোর পূর্বক প্রয়োগ করেন।

J. S. Furnival বুর্জোয়া পন্ডিতদের বশ্চ বিরোধী বক্তব্য গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি বেশ কিছু পরিসংখ্যান পরিবেশন করে 'দ্বীপপুঞ্জ কিছুই পায়নি' বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের এরূপ ঢালাও মন্তব্য নাকচ করে দেন। তিনি বলেন যে, ত্রিশ বছরে জাভার জনসংখ্যা ৬ থেকে ৯১/২ মিঃ এ উন্নীত হয়। তাছাড়াও ধান রপ্তানী ও ধানের মূল্য বৃদ্ধিকে তিনি জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধির দ্যোতক বলে প্রমাণ করতে চান।[৫২] Hall, Furaivall এর মত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনা একেবারে নাকচ করেননি। তিনি স্বীকার করেন যে, জাভা জনতার উপর নির্যাতন চলেছিল। তবে এর জন্য তিনি বশ্চ প্রবর্তিত ব্যবস্থার সমালোচনা না করে এই ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট দুরাত্মা পরিচালকদের সমালোচনা করেন। B.H.M. Vlekee ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট Cuntroller দের কঠিন সমালোচনা করেন।[৫৩] হল ঐ সময়ে ডাচ শাসনের দুটি বিচ্যুতির কথা বলেন। প্রথমতঃ ডাচরা প্রত্যন্ত দ্বীপগুলোকে উপেক্ষা করে কেবল জাভার উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করেন। এই সমালোচনার অবশ্যই গুরুত্ব আছে। কেননা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়নের প্রতি সমান নজর না দিলে ইতিহাসের জের হিসাবে একদিন বিচ্ছিনতাবাদ ও আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম হয়। দ্বিতীয়তঃ তারা জলদস্যুতা দমনের প্রতি নজর দেয়নি।[৫৪] সম্ভবত হলের এরূপ সমালোচনাও সঠিক।

কালচার সিস্টেম সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনার ধরণ ধারণ হতে মনে হয় পন্ডিতগণ এই ব্যবস্থার মূলচরিত্র বিশ্লেষণ মনোযোগ দেননি। তৎকালীন জাভার অবস্থার জন্য তারা হয় একক ব্যক্তি বশ্চকে দায়ী করেছেন, নয়ত এই ব্যবস্থা বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিচালকমন্ডলীর উপর সকল দায় ভার অর্পণ করেছেন। এরূপ বিচার পদ্ধতিতে ব্যবস্থাটির প্রকৃতি (Nature) ধরা পড়ে না। আমাদের প্রশ্ন এই ব্যবস্থার ক্রটি-বিচ্যুতি, অন্যায় ও নির্মমতার জন্য কেবল বশ্চকে এককভাবে দায়ী করা কি ন্যায় সংগত হবে? তিনি কি তৎকালীন হেগ সমাজের প্রভাবশালী সংখ্যাগরিষ্ট অংশের সফল প্রতিনিধি ছিলেন না? ১৮৩২ সালে স্বয়ং রাজা কি তাকে নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রদান করেননি? বস্তুতঃ কোন ব্যবস্থার পশ্চাতে সঠিক নীতি ও ভিত্তি না থাকলে কেবল একক ব্যক্তি বা কতিপয় মানুষের ইষ্ট-অনিষ্ট চিন্তা কি সেই ব্যবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে পারে? যদি ব্যবস্থাটি অত্যাচার মূলক হয় তবে মংগলকামী সুপরিচালকের হাতে অত্যাচারের মাত্রা হয়ত কিছু কম-বেশী হতে পারে। কিন্তু অত্যাচারের অবসান কল্পনা করা যায় কি? ব্যবস্থাটি যদি অত্যাচার মূলক হয় তবে কল্যাণকামী পরিচালকের সৎ প্রচেষ্টাও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বশ্চ নীতির অন্তঃনিহিত প্রবণতাটি কি ছিল? বশ্চ নীতিটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে আলোচনা করলে এক কথায় বলা চলে যুদ্ধ বিধ্বস্ত হল্যান্ডকে বাঁচানোর লক্ষ্যে জাভার কাঁচামালের সর্বোচ্চ ব্যবহার করার জন্য এই নীতি প্রবর্তনও কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। আঠার শতকের বাধ্যতামূলক পণ্য সরবরাহ নীতি (Forced delivery System) এ সময় অকেজো হওয়ায় অনুকূল পরিবেশে বশ্চনীতির প্রবর্তন করা হলেও মর্মবস্তুতে তা ছিল মূলত ঐ বাধ্যতামূলক সরবরাহ নীতির রকমফের মাত্র। অর্থাৎ এই ব্যবস্থার মূল সুর ছিল জাভায় বাণিজ্যিক একচেটিয়াবাদ অক্ষুন্ন রাখা। আর এটাই হল সামন্ততান্ত্রিক আতি-অর্থনৈতিক অত্যাচারমূলক শোষণ ব্যবস্থা (Exta-Economic Exploitation)। এর মাধ্যমে ১৮৩০-৫০ সালের মধ্যে জাভায় সৃষ্ট নতুন সম্পদ জাভা হতে পুরোপুরি নিঃসরিত হয়। ফলে এ সময় হল্যান্ডে আর্থ-সামাজিক বিকাশের কেবল গতিবেগ সৃষ্টি হয়নি, তার আর্থ-সামাজিক বিকাশের নতুন ধারাও সৃষ্টি হয়। এই সময় হতে গড়ে ওঠে উদ্যোগী বুর্জোয়া শ্রেণী। এই উদ্দিয়মান শ্রেণী অনুধাবণ করে যে, তাদের অধিকতর বিকাশে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক ছিল সরকার প্রবর্তিত একচেটিয়া বাণিজ্যতন্ত্র। অর্থাৎ এ সময় একচেটিয়া বণিক পুঁজির সাথে উদীয়মান শিল্প পুঁজির বিরোধ দেখা দেয়।

বস্তুতঃ উনিশ শতকের চল্লিশের দশকের শেষ দিক হতে হল্যান্ডের অনেকেই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু করে। প্রথম দিকে এই সমালোচনা বিতর্কের ক্ষেত্র ভূমি ছিল পার্লামেন্ট। ১৮৪৮ সালে পার্লামেন্ট সদস্যরা

ঔপনিবেশিক সমস্যা নিয়ে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ লাভ করলে এ বিষয়ে বির্তকের সূচনা হয়। এই সময় পার্লামেন্ট সভ্যরা রক্ষণশীল (Conservative) ও উদারপন্থী (Liberal) এই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। রক্ষণশীলরা ছিল মূলতঃ একচেটিয়াবাদী বাণিজ্যিক সামন্ত শ্রেণীর প্রতিভু। পক্ষান্তরে উদারপন্থীরা ছিল বিকাশমান বুর্জোয়া ও পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর মুখপাত্র। পার্লামেন্টের রক্ষণশীল সদস্যরা Culture System এর মাধ্যমে জাভায় বাধ্যতামূলক শ্রম নীতি (Forced Labour) অক্ষুন্ন রাখার পক্ষে ছিল। কিন্তু তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী উদার নৈতিক সভ্যরা ছিলেন অবাধ শ্রম নীতিতে (Free Labour) বিশ্বাসী এবং দ্বীপপুঞ্জে সরকারী একচেটিয়াবাদের পরিবর্তে ইউরোপীয় মূলধনের অবাধ অনুপ্রবেশের পক্ষপাতি।[৫৫] তৎকালীন মানবতাবাদী ধর্মীয় সংগঠনও উদারনীতিবাদীদের সমর্থন করে। এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, উদারনীতিবাদীদের এরূপ অবস্থানের পশ্চাতে জাভার কৃষকদের জন্য কল্যাণ চিন্তা যতটুকু না ছিল, তার চেয়ে অধিক ছিল নিজেদের পুঁজিতান্ত্রিক স্বার্থ চিন্তা। বস্তুতঃ তারা উপলব্দী করতে সক্ষম হয় যে, দ্বীপপুঞ্জে যে বাণিজ্যিক একচেটিয়াবাদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তা তাদের নবতর ও অধিকতর বিকাশের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। তাই তাদের অধিকতর আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির স্বার্থেই জাভা তথা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে একচেটিয়া বণিকতান্ত্রিক সামন্ত শোষণের অবসান ঘটানো প্রয়োজন।[৫৬] ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্ধিতার এই যুগে সংরক্ষিত বাজারের ব্যাপারটিও তাদের পক্ষে উপেক্ষা করার অবকাশ ছিল না। তাই উদার নীতির প্রবক্তারা প্রচলিত কৃষিনীতি বা কালচার সিস্টেম বাতিল করে জাভায় অবাধ মুক্ত উদ্যোগ প্রবর্তনের জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ওলন্দাজ পন্ডিত ভ্যান হিভল (Baron Van Hoevall) হেগ সংসদের নিম্ন কক্ষের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তার প্রচেষ্টায় কৃষিনীতি বিরোধী আন্দোলন গতিবেগ লাভ করে।

১৮৫৪ সালে ওলন্দাজ সরকার একটি প্রশাসনিক বিধি (Regerings-reglement) প্রণয়ন করেন যা ১৮৫৬ সালে কার্যকর হয়। এই বিধানে অন্যান্য প্রসংগের সাথে কালচার ব্যবস্থাটিও রহিত করা কথা থাকলেও রক্ষণশীলদের বিরোধিতার কারণে বাস্তবে ১৮৬৪ সালের আগে ব্যবস্থাটির রহিত করণ কর্ম সূচনা করা যায়নি। তবে ষাটের দশক ধরে চলে এই ব্যবস্থার সংস্কার কাজ।

১৮৬০ জাভায় ওলন্দাজ সরকারের প্রাক্তন রাজকর্মচারী E. Douwes Dakkar, মূলতাতুলী (Multatuli) ছদ্ম নামে 'Max Havelaar' (The Coffee Auctions of the Dutch Trading Company) শিরোণামে একটি উপন্যাস রচনা করেন। জাভায় ডাচ শাসন ও শোষণ এবং কালচার ব্যবস্থা ও এর আওতায় কৃষকদের উপর অমানবিক অত্যাচারের নির্মম সমালোচনা ছিল এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। পুস্তকটি অনেকাংশে সমকালীন বাংলার নীল চাষের বিরুদ্ধে দীন বন্ধু

মিত্রের রচিত 'নীল দর্পণ' এর সাথে তুলনীয়।[৩৭] প্রায় একই সময় Issace Fransen Van der Putte 'জাভায় চিনি চুক্তি বিধি' (The Regulation of Sugar Contracts in Java) শীর্ষক এক হশতেহার প্রকাশ করেন। উপরোক্ত দুটি রচনা প্রকাশিত হলে কালচার নীতির বিরুদ্ধে প্রচন্ড ক্ষোভ ও সমালোচনা সংসদীয় পরসীমা অতিক্রম করে আপামর জনসাধারণের মধ্যেও সম্প্রসারিত হয়। ১৮৬০ সালে ডাচ সরকার দাস ব্যবস্থা উচ্ছেদ করলে কালচার নীতি বিরোধী আন্দোলনের আরো একধাপ অগ্রগতি হয়। কেননা কালচার ব্যবস্থা ছিল মূলত আধা দাসত্বমূলক বিধি (Semi Slavery)।[৩৮]

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, বাংলার নীল বিদ্রোহ এবং জাভায় ডাচ কৃষিনীতি বিরোধী সংগ্রাম সমসাময়িক ঘটনা। এ ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে বাহ্যত সাদৃশ্যের চাইতে বৈশাদৃশ্য প্রকট হলেও মর্মবস্তুতে উভয় ঘটনার মধ্যে বৈশাদৃশ্যের তুলনায় সাদৃশ্যই প্রবল। বাংলার নীল বিদ্রোহ অবশ্যই বাংলার কৃষক বিদ্রোহ। তবে এর পশ্চাতে ছিল তৎকালীন বাংলার ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অনেক আমলার সক্রিয় সহানুভূতি ও ইংল্যান্ডের উদার বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন।[৩৯] ইংল্যান্ডের মত হল্যান্ডের বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরাও তাদের উন্নয়ন কৌশল হিসাবে শিল্প পুঁজি বিকাশের সমর্থক এবং পুরনো একচেটিয়া বাণিজ্যতন্ত্রের কঠোর সমালোচক। তারা মনে করতেন যে, তাদের উপনিবেশ হতে একচেটিয়া বাণিজ্যতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে তদস্থলে মুক্তবাজার নীতির প্রতিষ্ঠার মধ্যে নিহিত আছে শিল্প পুঁজি পূর্ণবিকাশ রহস্য। বস্তুতঃ উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপে উন্নয়ন কৌশলের মতাদর্শগত বিতর্কে মুক্ত বাজার নীতির জয় হয়, বুর্জোয়া গণতন্ত্র মুক্তি পায়। জাভায় ডাচ কৃষিনীতি পরিত্যক্ত হয়, বাংলায়ও নীল চাষ বন্ধ হয়। কেননা সর্বত্র শিল্প পুঁজিবাদের বিকাশের মর্মবস্তু ছিল অভিন্ন।

উপরে আলোচনায় দেখা যায় যে, ষোল শতকের শেষ দিকে হল্যান্ডের ডাচ জাতি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে এবং বাণিজ্য পুঁজির স্বার্থে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হতে পর্তুগীজদের আধিপত্য বিনষ্ট করার জন্য আলোচ্য অঞ্চলে পর্দাপন করে। এখানকার মশলারাজ্যে তাদের একচেটিয়া বাণিজ্যতন্ত্র স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহ করায়ত্ব করে। তবে তাদের এই রাজ্য জয় প্রক্রিয়ায় তারা নিজেরাই নৌ-শক্তি হতে একটি স্থল শক্তিতে পরিণত হয়। সতের শতকের শেষ দিকে স্বদেশ ও উপনিবেশে ডাচদের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় আঠার শতকের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বাণিজ্যতন্ত্রিক শোষণ মূলক কৃষিনীতি প্রবর্তন করে। ফলে হল্যান্ডের রাজা ৬ষ্ঠ উইলিয়াম স্বদেশ ও উপনিবেশের পূণর্গঠনের জন্য অবাধ বাণিজ্য নীতি এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জকে অবাধ বাণিজ্যের জন্য উম্মুক্ত বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু হল্যান্ডে ছিল ব্যক্তিগত পুঁজির

প্রচন্ড অভাব। দেশের উদ্যোগী বুর্জোয়া শ্রেণী বিকশিত না হওয়ায় বাজার ঘোষিত পূর্বোক্ত নীতি অকার্যকর হয়। এমতাবস্থায় ডাচরা পুনরায় কৃষি ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়। উপনিবেশ জাভায় বাধ্যতামূলক কৃষিনীতি চালূ করে। বস্তুতঃ এটি ছিল সামন্ততান্ত্রিক একচেটিয়াবাদী বাণিজ্যতান্ত্রিক শোষন ব্যবস্থা। উনিশ শতকে বিশ্ব পরিস্থিতি পরিবর্তিত হওয়ায় জাভার শোষনে হল্যান্ডে ব্যক্তিপুঁজির প্রাচুর্যে দ্রুত অর্থনৈতিক অবকাঠামো গড়ে ওঠে; বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ ঘটে। এই উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী ও তাদের প্রতিনিধি বুদ্ধিজীবীরা অনুধাবন করেন যে, এই সামন্ততান্ত্রিক বাণিজ্যিক একচেটিয়াবাদ তাদের অধিকতর বিকাশের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। কেননা তারা স্বদেশে যে ভোগ্য পণ্য উৎপাদন করছে জাভায় তার বাজার সৃষ্টি হচ্ছে না। ১৮৪৯ সালে উদারপন্থীরা তাই সংসদের জাভা প্রশ্ন উত্তাপন করলেন। এ যেন আঠারো শতকের সত্তরের দশকে ইংল্যান্ডের কমন্স সভায় হুইগ দল কর্তৃক উত্থাপিত 'ভারত প্রশ্নের' হেগ সংস্করণ। যা হোক হেগ যতই বুর্জোয়া বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, ততই জাভার নতুন পশ্চাদমুখী কৃষিনীতির দুর্বলতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও প্রগতি বিরোধী চরিত্র পরিস্ফুটিত হয়। অবশেষে হেগের বুর্জোয়া শাসন নীতিগতভাবে এই বাণিজ্যিক একচেটিয়াবাদের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

তথ্যনির্দেশ

১. মোহাম্মদ মুসা আনসারী, *ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা, ১৯, ২৩।

২. Clive Day, *The Policy and Administration of the Dutch in Java*, Oxford University Press, 1960, p.243.

J.S. Furnival, *Netherland india*, Cambridge, 1967, p. 115; D.E.G. Hall, *A History of South-East Asia* , New York, 1968, p.546.

৩. B.H.M. Vlekee, *Nusantara, A History of Indonesia*, The Hague, 1956, p.434.

Ailsa, Zainuddin, *A Short History of Indonesia*, Australia, 1968, p.128.

৪. G.M. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia: A History* . New York, 1952, p.8.

৫ Ailsa Zainuddin, *op.cit*, p.128.

৬. *Ibid*, p.128.

৭. মুসা আনসারী পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮।

৮. D.E.G. Hall, *op. cit*, p.....?

৯. মুসা আনসারী , পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮

১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ আঠার

১১. Om Prakash, *The Dutch East India Company in Bengal*, I.E.S.H, p.p.80-81.

১২. মুসা আনসারী. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮।

১৩. Contingencies were of the form of tribute in kind levied on districts under the company's direct control, while forced deliveries were in products which cultivators were forecd to grow and deliver at fixed price; D.E.G. Hall, *op. cit*. p.331.

১৪. B.H.M. Vlekee, *The Story of the Dutch Indies*. Harvard, 1945. p.135.

১৫. *Ibid*, p.136.

১৬. *Ibid*, p.145.

১৭. Cornelis Theodorus Elout এর সভাপতিত্বে গঠিত এই কমিশনের জন্য দুজন সদস্য ছিলেন - Baron Vender Capellen এবং A.A. Buyskes; D.E.G. Hall, *op. cit*., p.589.

১৮. D.R. Sardesai, *Southeast Asia, Past and present*, Delhi, 1981, p.132.

১৯. J.F. Cady, *South East Asia, Its historical Development*, New York, 1964, p.356.

২০. D.E.G.Hall, *op. cit*. p. 542; D.R Sardesai, p.133.

২১. জাভা যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, D.E.G. Hall, Ailsa Zainuddin; D.R. Sardesai প্রমুখের বিবরণী

২২. J. J. Van Kelvern, উদ্ধৃতি J. F. Cady, *op. cit*. p. 358.

২৩. J. F. Cady , *op. cit*., p.359.

২৪. D.R. Sardesai, *op. cit*., p.135.

২৫. Hall, *op. cit*., pp. 546-47.

২৬. Clive Day. *op. cit*., p.p.249-50, J.S. Furnivall, *op.cit*., p.p.118-19.

২৭. জাভা যুদ্ধের পর দ্বীপপুঞ্জে ওলন্দাজ কর্তৃত্ব সম্প্রসারণের স্বর্ণ যুগ ছিল। এ সময় মধ্য জাভায় জোক-জার্কাতা থেকে সুরা কারতাং বানজুমাল, কোলেন, মেভিয়াম এবং কেদারী সরাসরি ওলন্দাজ শাসনাধীন হয়। কালচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য নিঃসন্দেহে এটি একটি অনুকূল সময় ছিল।

২৮. Hall, *op.cit.*, p.547.

২৯. B.H.M. Vlekee, *The Story of the Dutch Indies*. Harverd 1945. p.155.

৩০. *Ibid*, p.158.

৩১. মুসা আনসারী , পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৪।

৩২. J. S. Furnivall, *op.cit.*, p.120.

৩৩. D.E.G. Hall, *op. cit.*, p.547.

৩৪. জহর সেন, *দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস (মালয়-ইন্দোনেশিয়া)*, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃঃ ১১৯।

৩৫. Clive Day, *op. cit.*, p.281.

৩৬. জহর সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২০।

৩৭. B.H.M. Vlekee, *op. cit.*, p.136.

৩৮. Hall, *op. cit.*, p. ..., C. Day, *op-cit.*, p. 270, Vander Klolff, cited in Khain, *op. cit.*, p.12.

৩৯. Hall, *op. cit.*, p.548.

৪০. Ailsa Zainuddin, *op. cit.*, p. 129, Vender Kolff, p. 108.

৪১. The New Encyclopaedia Britanicca, Vol. III, (15th ed.) p. 288

৪২. মুসা আনসারী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৫।

৪৩. জহর সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৯।

৪৪. Vlekee, *op. cit.* p.157.

৪৫. Furnivall, *op. cit.* p.138.

৪৬. জহর সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৮।

৪৭. Vlekee, *op. cit.* p.156.

৪৮. Vlekee, *Nusantara*, pp 291-92.

৪৯. Leslie Palmer, *Indonesia*, London, 1965, p.69.

৫০. মুসা আনসারী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৮।

৫১. Hall, *op. cit.*, p.549.

৫২. উদ্ধৃতি মুসা আনসারী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৭।

৫৩. Vlekee, *Nusantara*, p.291.

৫৪. উদ্ধৃতি মুসা আনসারী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৭।

৫৫. L. Palmier, *op. cit.* p. 71.

৫৬. মুসা আনসারী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৯।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯।

৫৮. J. F. Cady, *op. cit.* p. 364.

৫৯ মুসা আনসারী, *বাংলায় নীল বিদ্রোহ, বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ,* ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা, ঢাকা, ১৯৯২, পৃঃ ১৯১।